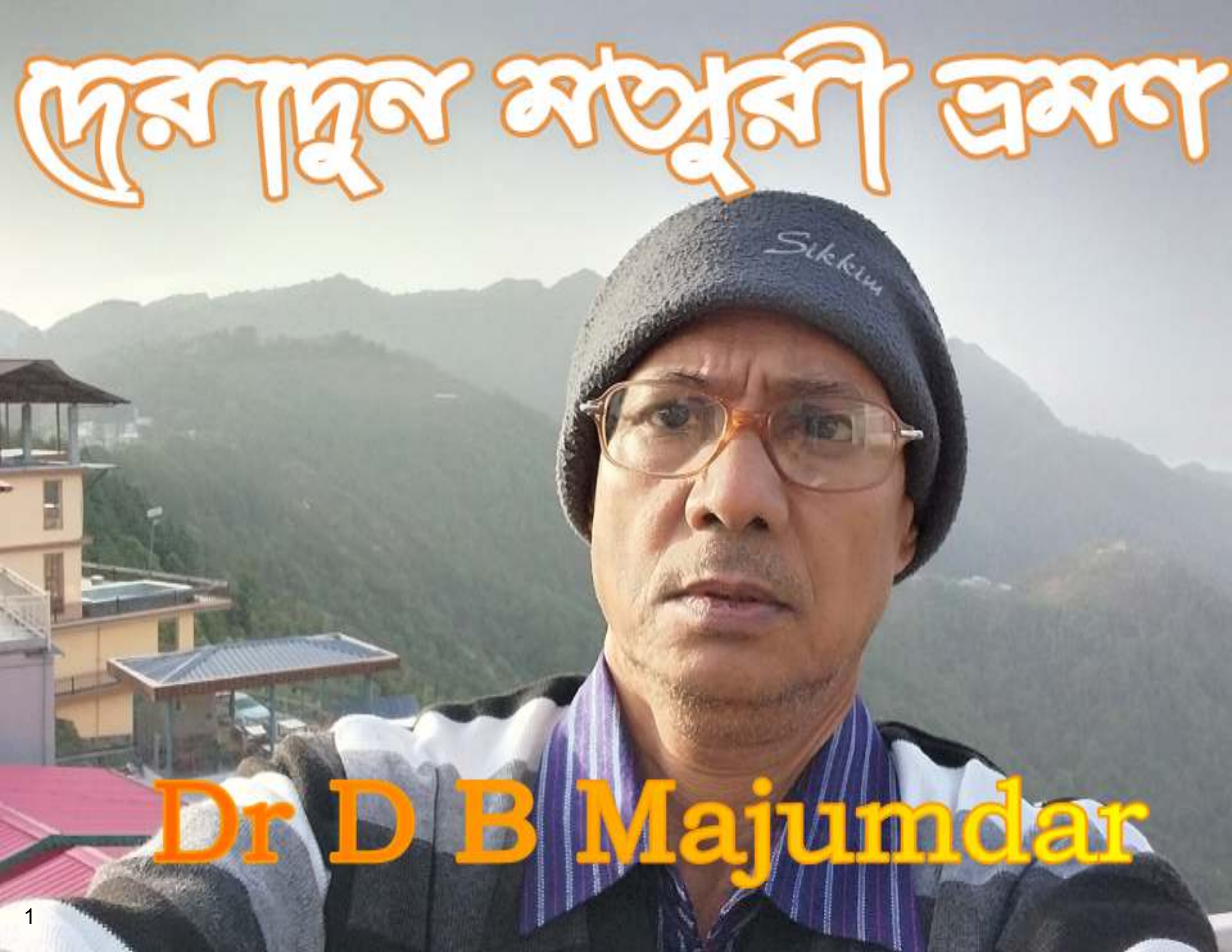

দেরাদুন মসুরী ভ্রমণ
Sikkim
Dr D B Majumdar

মসুরি ভ্রমণ

এ বছরের প্রথম ভ্রমণ শুরু হল আজ বৈশাখের তিন তারিখ। এবার চললাম দেরাদুন মুসৌরীর (ওখানে গিয়ে জানলাম, ওরা মসুরি বলে)দিকে। ঠিক দুই মাস আগে, সকাল আটটায় টিকিট কেটে এই ভ্রমণের কাজ শুরু করেছি। টিকিট কাটার সাথে সাথেই দেরাদুনের স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও বুক করেছি। হাওড়া থেকে প্রতিদিন এই একটি ট্রেনই ওদিকে যায়। দুপুর একটায় ছেড়ে পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ পৌঁছনোর কথা। এই জন্য একবার ভেবেছিলাম, দিল্লি গিয়ে সেখান থেকে ট্রেন পাল্টে যাবো। খুব একটা সুবিধা হবে না দেখলাম।

কুম্ভ এক্সপ্রেস

দেরাদুন তো এখন গরম থাকারই কথা। ওখান থেকে মুসৌরী গেলে একটু পাহাড়ি এলাকা। কিন্তু গত বছর নৈনিতালের দিকে গিয়ে দেখেছি, বেশ গরম পড়ে। পাহাড় বললে আমরা যেমন আমাদের দার্জিলিং বা সিকিম এর মত ঠাণ্ডা আবহাওয়া বুঝি, ওদিকে সেরকম একদিনও পাই নি। মুসৌরিও সেরকম হতাশ করবে না, আশা করছি।

এবার রিটায়ারিং রুম বুক করার সময় একটা সমস্যা হল। ফেরার দিন দেরাদুনের রিটায়ারিং রুম বুক করার টাকা কেটে নিল, বুকিং কনফার্ম হল না। পরে জানাল, টাকা দিতে দেরি হয়ে গেছে, টাকা ফেরৎ করে দিয়েছে। আমার বন্ধুর কন্যা মেঘা, দেরাদুনে কয়েক বছর থেকেছে। ওর মতে দেরাদুন মুসৌরি হট্টগোলের জায়গা, দেখার কিছু নেই। আমরাও দারুণ কিছু দেখার আশা করছি না। মাত্র কদিন আগে জানলাম, মুসৌরির দিকে ধনোউলটি নামে একটি পাহাড়ি জায়গা আছে । ওখানে একদিন থাকব ঠিক করলাম।

এক বছরের বেশি হল বেশ কিছু ট্রেনে করে যাতায়াত করছি। এবারই প্রথম হল, ট্রেন ছাড়ার সময় পিছিয়ে দিয়েছে। দুপুর একটায় ছাড়ার সময় ছিল। সাড়ে নটা নাগাদ মোবাইলে মেসেজ এল, দুটো পঁয়ত্রিশ নতুন সময়। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। আমাদের এগারোটার মধ্যে খেয়ে নিতে হত। আরও এক ঘন্টা পর বেরোলাম। দমদম থেকে মেট্রো করে হাওড়া স্টেশন এলাম। ঘন্টা দেড়েক আগে পৌঁছে গেলাম। মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলাম, বেশ গরম। ট্রেন ছাড়ার মিনিট দশেক আগে প্ল্যাটফর্মে গাড়ী দিল। আমরা একটি করে ছোট ট্রলী ব্যাগ

নিয়ে উঠি। প্রায়ই দেখা যায়, লোকে এত বেশি বোঝা নিয়ে ওঠে যে সিটের নিচে সবার ব্যাগ রাখার জায়গা হয়না। এবারও দেখলাম, একটি বিয়ে বাড়ীতে যাওয়ার দল এত বেশী বোঝা নিয়ে চলেছে যে, দুইজন কুলী আর গোটা তিনেক জোয়ান লোক মিনিট পনের ধরে শুধু মালপত্র তুলেই গেল।

এই ট্রেন বর্ধমানে থামে না। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙে দেখি বর্ধমান পেরিয়ে গেছে। রেল লাইন এর পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের চাষ। আমাদের মেদিনীপুরের গ্রামের ওদিকে পয়লা বৈশাখের আগেই সব বোরো ধান কাটা হয়ে গেছে। এদিকে দেখছি ধান পাকতে আরও দিন পনের কুড়ি লাগবে। দুর্গাপুর কখন পেরিয়ে গেছে খেয়াল করিনি। সন্ধ্যার পরই ট্রেন বিহারে ঢুকে গেল। স্টেশনের নাম জামতাড়া। নাম দেখলেই মনে ভয় জাগে। কত রকম কারণেই এক একটা জায়গা বিখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে যায়।

এমনিতেই আমরা এখন রাত্রে তাড়াতাড়ি শুয়ে যাই। ট্রেনে তো আরও আগেই। প্রথম দিন বিশেষ কোন ঘটনা ছাড়া এই ভাবে শুরু হল এবারের ভ্রমণ।

রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে দেখলাম দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সকাল হল উত্তর প্রদেশে। লখনউ এর একশ কিমি মত আগে থেকেই রেল লাইন এর পাশের মাঠের ছবি অন্য রকম দেখছি। এদিকে মাঠ ভর্তি শুধুই পাকা গম। কোথাও কোথাও গম কাটা হচ্ছে।

রাত্রে আমাদের পাশের বার্থে একজন টিটি এসে একেবারে অফিস খুলে বসেছে দেখেছিলাম। প্যান্ট্রি কারের ছেলেরা ওকে বেশ খাতির করছে দেখেছি। সকালে একজন সাদা জামা প্যান্ট পরে ভদ্র ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞেশ করে পাশে বসেছিল। একটু পরে সে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখলাম। টিটি সাহেব এর জন্য একটি ছেলে , ছোট গ্লাসকে করে চা আনল। উনি আমার পাশের ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, গার্ড সাহেবকেও চা দাও। ঘুম ভাঙ্গিয়ে চা দিতে গেলে, গার্ড সাহেব কিছুতেই চা নিলেন না। পরে বললেন, এরা যেভাবে চা বানায় একবার দেখেছি। ঐ দেখলে আর চা খাওয়ার ইচ্ছা হবে না। উনি দেখেছেন, এরা ট্রেনের টয়লেটের জল ড্রামে ভরে, স্নান করার জন্য যে বৈদ্যুতিক ডোবানো হিটার ব্যবহার করা হয় তাই দিয়ে জল গরম করে। সত্যিই এসব জানলে আর ট্রেনে চা খাওয়ার ইচ্ছা থাকবে না। লখনউ পেরোনোর পর একটা সময় , মাইল এর পর মাইল আমের বাগান দেখলাম। এবার এদিকেও ভালো আম হয়নি। চল্লিশ বছর আগে এদিকের মাঠে অনেক ময়ূর দেখা যেত, এখন আর একটাও নেই। ট্রেন এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেটে চলছে। দেরাদুনে সন্ধ্যায় পৌঁছলেই হল।১৮.৪.২০২৫.

দেরাদুনের দিকে 2

গমের মাঠে গম কাটা চলছে। বেশিরভাগই কাটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মাঠের ভেতর বালির স্তুপের মত দেখছি; ওগুলি কি একটু পরেই দেখলাম। মাঠের মধ্যেই মেসিন দিয়ে গম ঝাড়াই হচ্ছে। ঐ বালির মত জিনিসগুলি গমের ভূষি। এগুলি নিশ্চয়ই কোন কাজে লাগবে। আমাদের ওদিক গমের চাষ নেই, তাই এসব দেখিনি।

মাঠে গমের ভূসি

উত্তর প্রদেশের গ্রাম গঞ্জের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলেছে। খুব সকালে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে একটা জিনিস বোঝা যায়; এদিকে এখনও খোলা মাঠে পায়খানা বেশ চলছে। লখনউ পেরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে দশটা নাগাদ। মাইল এর পর মাইল আমের বাগান চলল এক সময়। ফারাক্কা পেরিয়ে মালদা জেলায় এরকম আমের বাগান দেখা যায়। আমাদের সাথে যে বিয়ে বাড়ীর দল চলেছে এদের সাথে একটি বছর চারেকের বাচ্চা ছেলে আছে। কাল সন্ধ্যায় ঘন্টা দুই ওর মামাকে ব্যস্ত রেখেছিল। আজ দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এক আঙ্কলকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখল। এই লোকটি বোধহয় ওদের কর্মচারী, বেচারা দুই ঘন্টা অত্যাচার সহ্য করে এক সময় উপরের বার্থে উঠে শুয়ে পড়ল। বাচ্চাটা একবার আমার কাছে এসে কিছু বলার চেষ্টা করছে দেখে ওর দাদু ওকে ফল খাওয়াতে ধরে নিয়ে গেল।

হরিদ্বারে ঠিক সময়েই পৌঁছে গেল ট্রেন। বিয়ে বাড়ীর দল এখানে নেমে গেল। নামার সময় দেখলাম ওদের লটবহর নামাতে নামাতে ট্রেন ছেড়ে দিল। একটু এগিয়েই আবার থামল। হরিদ্বার ছেড়ে মিনিট দশেক চলার পর রেল লাইন এর দুই পাশে বেশ ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলল।

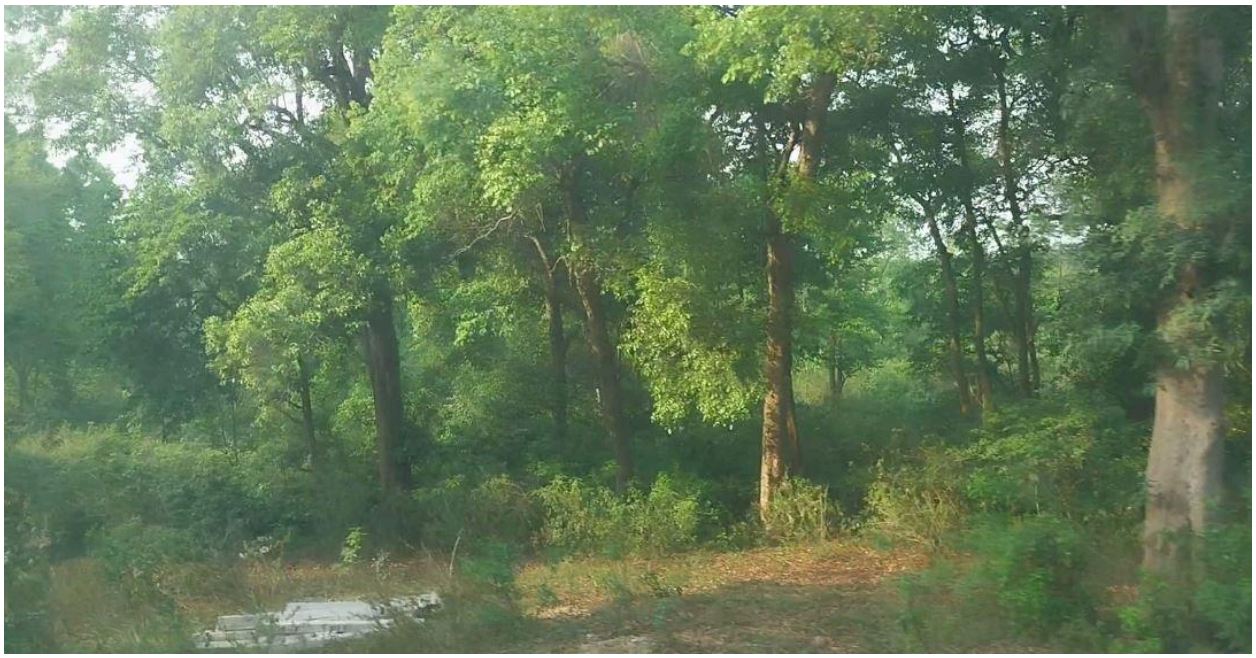

এখানেও কিন্তু জঙ্গল বেশ ঘন আর সবুজ। এটা রাজাজী ন্যাশনাল পার্ক। এখানে হাতি আর বাঘও আছে, বোর্ডে দেখলাম। আমি শুধু একটা শুকনো নদীর বুকে তিনটি ময়ূর দেখলাম। হরিদ্বার থেকে দেরাদুন সিঙ্গেল লাইনে ট্রেন চলে। মাঝে দৈওয়ালা স্টেশনে তিনটি লাইন আছে। এখানে আমাদের গাড়ী মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকল। উল্টো দিকের একটি ট্রেন পেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের গাড়ী ছাড়ল। ট্রেন ঠিক সময়ের একটু আগেই দেরাদুন পৌঁছে গেল। আমি কিন্তু চাইছিলাম, ট্রেন অন্তত এক ঘন্টা দেরী করে পৌঁছক। আমার রিটায়ারিং রুমের বুকিং আটটা থেকে। ঘন্টা দুই বাইরে বেঞ্চে বসে কাটালাম। এর মধ্যে আমি বাইরে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ড, ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড, অটো সব দেখে এলাম।

পরদিন সকালে দেরাদুনে দেখার জায়গাগুলি ঘুরে দেখার জন্য একটি অটোর সাথে কথা বলে তার ফোন নম্বর নিয়ে এলাম। স্টেশনের পাশেই দুটি ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড। ওরা জানাল, দেরাদুন লোকাল ট্যুর দুই হাজার দুশ টাকা। অটো বারোশ টাকা নেবে। এখানকার রিটায়ারিং রুম বেশ বড়। সবই ঠিক আছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মের সাথে হওয়ায় মাইকের অত্যাচার আছে। রাত পৌনে দশটা পর্যন্ত লাগাতার ঘোষণা চলল। দেরাদুনে এখনও কোলকাতার মত গরম পড়েনি। আমি তো রাত্রে কম্বল গায়ে ঘুমালাম। 21.4.25.

দেরাদুন দর্শন

19 এপ্রিল ঠিক সকাল আটটায় অটো এসে গেল। আমরা অবশ্য ভোরে উঠে ষ্টেশন এর বাইরে একটু হেঁটে ঘুরে এসেছি। ষ্টেশন এর এদিকটা একটু পুরনো শহর। ঠিক ষ্টেশন এর উল্টো দিকে একটা পাঁচ তলা নতুন হোটেল ; এ ছাড়া উঁচু বাড়ী প্রায় নেই। অটো প্রথমে চলল, সহস্ত্রো ধারা। আমাদের বাঙালি উচ্চারণে যেটা সহস্র ধারা, সেটাই এরা এভাবে বলে কি না জানিনা। রাস্তার পাশে সব সাইন বোর্ডে কিন্তু ঐ Sahastra Dhara Road লেখা। শহর ছাড়িয়ে বোধহয় দশ বারো কিমি দূরে এই ধারা। এদিকে যাওয়ার সময় দেখলাম বেশ কিছু পাকদণ্ডি দিয়ে রাস্তা নিচে নেমে গেল। ট্রেনে আসার সময় কিন্তু এতোটা উপরে উঠেছি, বোঝা যায় নি। ঐ ধারা একটি পাহাড়ী নদী। ধাপে ধাপে নামার সময় গোটা কুড়ি পাথরের আল মত দিয়ে জল আটকে স্নানের জায়গা করে রেখেছে। অনেক লোক সেই সকাল নটা নাগাদ স্নান করতে নেমে গেছে।

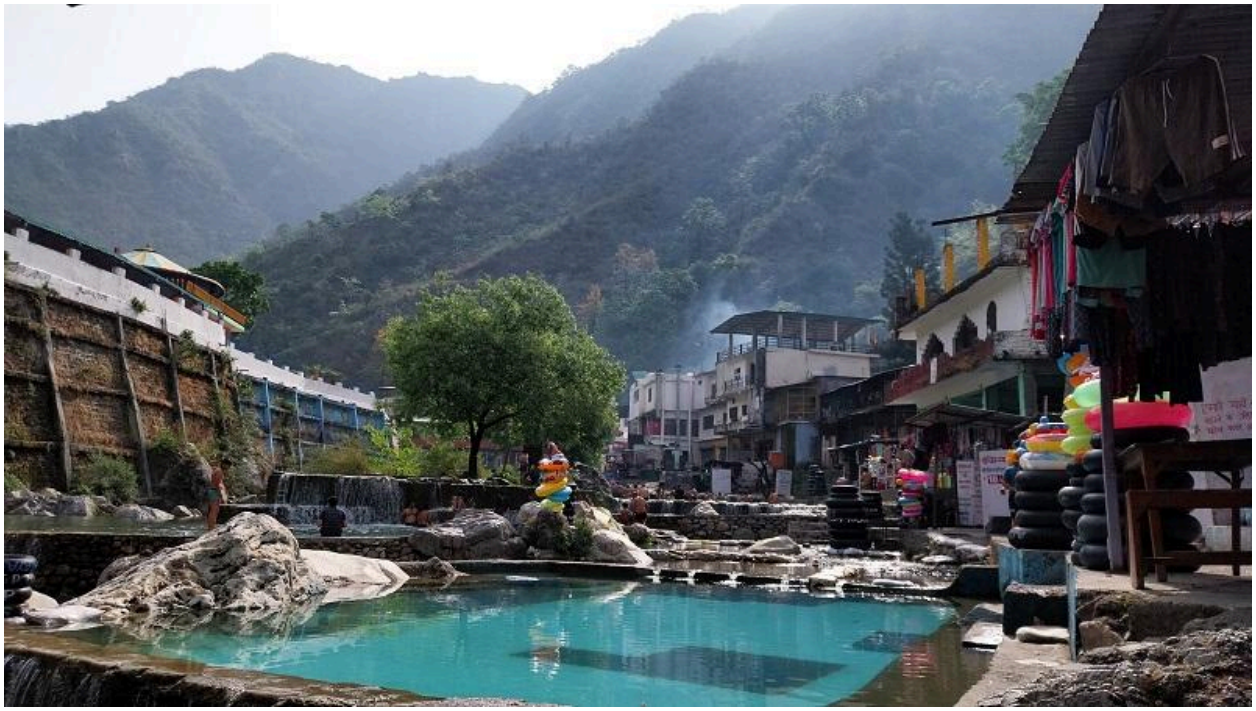

জল বেশ স্বচ্ছ। এই জলে নাকি প্রচুর গন্ধক আছে, চর্ম রোগের জন্য উপকারী। লোকে বড় বড় প্লাষ্টিকের ড্রাম কিনে তাতে করে জল নিয়ে যায়। হায়রে , কোলকাতার হাসপাতালের চর্ম রোগের বিভাগে প্রতিদিন চার পাঁচ শ রুগী হয়; সরকার এখানেও ঐ বিনা পয়সার জল এনে বিতরণ করতে পারে! উল্টো পারে পাহাড় থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো জল পড়ছে। কিছু লোক সেই জলে একটু মাথা ভেজাতে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। আমরা একটু দূর থেকে দেখে এলাম। ফেরার পথে অটোর তার কেটে গেল। আস্তে আস্তে চলল অটো। দুই- তিন কিমি দূরে সাই বাবার মন্দির। সুন্দর। ভিড় বা হৈ হৈ নেই । ওখান থেকে চললাম গুচ্ছু পানী।

একটা বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা ধরে এক কিমি মত নামতে হয়। আমাদের অটো ড্রাইভার ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে, মিনিট পাঁচেক চেষ্টায় অন্য একটা ধরে আমাদের তাতে উঠিয়ে দিয়ে, নিজের অটো সারাতে চলল। অটো যেখানে নামাল সেখান থেকে চার পাঁচ শ মিটার হেঁটে গিয়ে টিকিট ঘর। রাস্তার পাশে পাশে ছোট ছোট দোকান , সবাই

প্লাষ্টিকের চটি ভাড়া দিচ্ছে। কেউ বলে দশ টাকা, কেউ বলে কুড়ি টাকা। তিরিশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে চললাম। বাচ্চা বুড়ো, ছেলে মেয়ে সবাই হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে জলের উপর দিয়ে ছপ ছপ করতে করতে এগিয়ে চললাম। ঠাণ্ডা জলের স্রোত নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে নেমে আসছে। দুই পাশের পাথরের দেওয়ালের মত পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কোন রকমে দুই আড়াই জন লোক পেরনোর মত ফাঁকা। দেড়শ মিটার মত গিয়ে আর যাওয়ার রাস্তা নেই। তিন চার ফুট মত উপর থেকে জলপ্রপাতের মত জল নামছে। সব মিলিয়ে চল্লিশ মিনিট মত সময় লাগল। ফিরে এসে দেখি, আমাদের অটো চলে এসেছে।

এর পরের গন্তব্য টপ্পেশ্বর শিব মন্দির। আধ ঘন্টা মত চলে পৌঁছোলাম একটি ঘিঞ্জি জায়গায়। আশে পাশে অসংখ্য পূজার ডালা বিক্রীর দোকান। একটি দোকানে ডালা কিনে, জুতো জমা রেখে মন্দিরের দিকে চললাম। গোটা পঞ্চাশ সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা জায়গায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পঞ্চাশ জনের লাইন পেরোতে মিনিট কুড়ি লাগল। একটি বেশ ছড়ান শিব লিঙ্গের মাথায় সবাই একটু করে জল ঢেলে পূজা দিচ্ছে। এই শিব লিঙ্গের মাথায় একটু বাটি মত করা আছে। অনেকে এরপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা ছোট জলের ধারার কাছে যাচ্ছে। আমরা অটোতে ফিরে এলাম। একটি পাড়ার মধ্যে দিয়ে অটো চলল। মিনিট পনের পর পৌঁছে গেলাম ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর গেটে।

পনের টাকা করে টিকিট, আর অটোর জন্য পঁচিশ টাকা। দুই পাশে জঙ্গলের মত গাছপালার ভেতর দিয়ে প্রায় এক কিমি রাস্তা দিয়ে, ইনস্টিটিউট এর পিছন দিকের পার্কিং এ পৌঁছলাম। বিশাল লাল ইটের বাড়ী। অটো ড্রাইভার জানাল, এই বাড়ী তৈরী করতে কোন সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় নি। গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখতেই আধ

ঘন্টা লাগবে। টিকিট কেটে মিউজিয়াম দেখা যায়; আমরা দেখিনি। সামনের দিকে প্রায় এক কিমি মত বিস্তৃত প্রান্তরের মত বাগান। ফুলের গাছ প্রায় নেই। অনেক ছবি তুলে আমরা ফিরে চললাম।

একটার আগে স্টেশনে ফিরে এলাম।

স্টেশনের ভোজনালয়ে ডিম্ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম, মসুরির উদ্দেশ্যে। এদিকে এরা মসূরী বলে; আমাদের মত মুসৌরি বলে না। আমাদের এই বেরোনোর সময়টা ঠিক ছিল না। ঠিক মিনিট দশেক আগে দিল্লী থেকে শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন এসে পৌঁছেছে। অনলাইনে কোন ট্যাক্সি নেই। ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড খালি, অনেক সময় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি পেলাম। বাসের জন্য লম্বা লাইন, কোন বাস নেই। অন্য সময় দেখেছি, চার পাঁচ জন লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। দেরাদুন থেকে আমরা ট্যাক্সিতে রওয়ানা দিলাম প্রায় দুটো নাগাদ। দেরাদুনে এখনও সেরকম গরম পড়েনি। ২২.৪.২৫.

দেরাদুন ৪

দেরাদুন শহরে মাঝে মাঝেই বেশ জ্যাম লেগে যায়। স্টেশনের কাছে রাস্তাগুলি জেলা শহরের মত। শহর থেকে বেরোতে আধ ঘন্টা লেগে গেল। কিছু সময় পর থেকেই সামনে , বাঁ দিকে পাহাড়ের উপর শহর দেখা দেয়। উপরে উঠে বুঝলাম, ওটাই মসুরী শহর। মসুরি ঢোকার তিন চার কিমি আগে থেকেই রাস্তায় বেশ জ্যাম। আমরা চারটা নাগাদ মসুরির লাইব্রেরী চকে পৌঁছে গেলাম। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি থেকে নামতেই একজন কুলী পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে দেখি ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমাদের হোটেল ম্যাল রোডেই। একশ মিটার মত এগিয়ে, এক তলা মত নিচে নামতে হল। খুব সকালে ছাড়া ম্যাল রোডে গাড়ী ঢুকতে দেয় না।

ঘন্টা দেড় পর আমরা সোয়েটার গায়ে বেরোলাম। সাড়ে পাঁচটা থেকে ম্যাল রোডে মেলার মত ভির। ভ্রমণ স্থানে ভিড় হয়, কিন্তু এরকম ভিড় আর কোথাও দেখিনি।

মসুরি ম্যাল রোড

লাইব্রেরী চক থেকে একটু নিচে নেমে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড। এখানে পরদিন মশুড়ি ঘুরে ধনোউল্টি ছেড়ে আসার জন্য ট্যাক্সি ঠিক করে, পাঁচশ টাকা দিয়ে ম্যাল রোডে উঠে এলাম। ম্যাল রোড ধরে লোকজন হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাইব্রেরী থেকে পিকচার প্যালেস পর্যন্ত আড়াই কিমি রাস্তা। গোটাটাই মেলার মত। রাস্তার পাশে পাশে পার্কের মত কিছু বেঞ্চ করা আছে। হাঁটতে হাঁটতে একটু সময় বসে নিচ্ছে লোকে। কয়েকটা জায়গা থেকে দূরে নিচে দেরাদুন শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। সবাই ছবি তোলার চেষ্টা করছে। পিকচার প্যালেস এর দিকটা অনেকটা চড়াই উৎরাই আছে। এদিকে ভিড় যেন আরও বেশী। আমরা পুরোটা হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। আমার তো মনে হচ্ছিল মাথায় টুপী পরলে ভালো হত। কেউ কেউ আবার হাফ হাতা জামা বা টি শার্ট পরে ঘুরছে। আমরা আটটার মধ্যে হোটেলে ফিরে এলাম।

ম্যাল রোড থেকে দেরাদুন

পরদিন সকালে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই বেশ সকালে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে গেলাম। এবার আর ম্যাল রোডে না হেঁটে, আমরা ক্যামেল ব্যাক রোড ধরে চললাম। পাহাড়ী এলাকায় যেমন হয়, লোকজন বেশ দেরি করে ওঠে। এই ক্যামেল ব্যাক রোড দুই একজন করে লোক হাঁটতে বেরিয়েছে। এদিকে হোটেল বা দোকানপাট খুব কম। গাছপালা আছে। এক কিমি হেঁটে একটি ভিউ পয়েন্টে পৌঁছলাম। সামনেটা বেশ সুন্দর।

আকাশ ফাঁকা থাকলে এই দিকে হিমালয়ের বরফ সাদা চূড়াগুলি দেখা যায়। এবার আমরা একদিনও দেখতে পেলাম না। হোটেলে ফিরে, গরম জলে স্নান সেরে চেক্ আউট করে বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাল রোড ধরে একশ

মিটার হেঁটে, লাইব্রেরী চকে পৌঁছে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ট্যাক্সি এসে গেল। আটটা থেকেই ঐ জায়গায় গাড়ীর ভিড় শুরু হয়েছে। ঐ দিকেই একটা সরু গলি মত রাস্তা দিয়ে চললাম কেম্পটি ফলস দেখতে। মাঝ রাস্তায় ডান দিকের সরু গলি দিয়ে গেলাম বুদ্ধ মন্দির দেখতে। সুন্দর সাজানো মন্দির। ঐ সকালে তেমন যাত্রীর ভিড় ছিল না। মন্দিরের গেটের উল্টো দিকে সরু রাস্তা উঠে গেছে দলাই হিলে। মিনিট দশেক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে চারি দিকে সুন্দর দৃশ্য। একটি বড় বুদ্ধ মূর্তি আছে। সকলে সেখানে ছবি তুলে নিচ্ছে।

এরপর মিনিট দশেক চলার পর কোম্পানি গার্ডেন। এখন নাম হয়েছে অটল উদ্যান। পঁচিশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সুন্দর বাগান।

ভেতরেই কিছু খাওয়ারের দোকান আর শীতের পোশাকের দোকান। আমরা একটি দোকানে সামান্য কিছু কিনলাম। গেটের বাইরে একটি দোকানে বসে দু কাপ কফি খেয়ে আবার গাড়ীতে উঠলাম। এখান থেকে মিনিট কুড়ি লাগল কেমপ্টি ফলস যেতে। এক জায়গায় রাস্তার থেকেই দুরে জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। রাস্তা ঘুরে গিয়ে ফলস্ এর ঠিক উপরে একটি বাজার মত জায়গায় পৌঁছে গেছে। এখানে নেমে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে ফলস এর কাছে যাওয়া যায়। তিনশ দশ সিঁড়ি। ইচ্ছা করলে কেবল কারে চেপে আড়াইশ সিঁড়ি কমানো যায়। আমরা গোটাটাই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। সিঁড়ির পাশে পাশে কয়েকশ দোকান। লোকে কিছু কেনাকাটি, দরদাম করছে। নীচের দিকে গোটা দশেক স্নানের পোশাক ভাড়া দেওয়ার দোকান। লোকে লকার নিয়ে তাতে ব্যাগ পত্র রেখে , স্নান করতে নেমে যাচ্ছে। জল যেখানে পড়ছে সেখানে একটা হাঁটুর ওপর জলের পুকুর মত। সেখানে শ'দেড়েক লোক নেমে হৈ হৈ করছে। আমরা মিনিট পনের একটা দোকানে বসে, চা খেয়ে উঠে এলাম।

গাড়ী এবার আমাদের নিয়ে চলল সোজা ধনোউল্টি। আবার সেই একই রাস্তা ধরে লাইবেরি চক হয়ে উল্টো দিকে চলল গাড়ী। ফেরার সময় রাস্তায় কয়েক জায়গায় জ্যাম পেলাম।

মুসুড়ি শহর ছাড়িয়ে এক দেড় কিমি নিচে নেমে, দেরাদুনের রাস্তা ডান দিকে রেখে, বাম দিকে গাড়ী চলল। আবার সেই পাহাড়ী আঁকাবাকা রাস্তা। মুসূরী থেকে ধনলটি তিরিশ কিমি রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে গভীর খাদ। কয়েকটি জায়গায় বাম দিকে হিমালয়ের বরফ সাদা চূড়া দেখার কথা। কিন্তু এবার আমরা একদিনও আকাশ পরিষ্কার পেলাম না। তবে কিনা, কলকাতায় যখন পোড়ানো গরম, মুসুরিতে আমাদের লেপ গায়ে ঘুমাতে হল। আমরা দেড়টা নাগাদ ধনোউল্টি পৌঁছে গেলাম। 23.4.25.

আজ ভোরে বাড়ী ফিরে এলাম।

দেরাদুন 5

ধনোউল্টি খুবই ছোট্ট একটি জায়গা। যেমন দার্জিলিং এর শহরের বাইরে অফ বিট জায়গাগুলি হয়, সেরকম। একটিই রাস্তা চলেগেছে গোঙ্গোত্রীর দিকে। তার পাশে পাশে গোটা পনের -কুড়ি হোটেল। একটি ছোট্ট বাজারে গোটা পনের -কুড়ি দোকান। আকাশ পরিষ্কার থাকলে নিশ্চয়ই হিমালয়ের চূড়াগুলি দেখা যায়। হোটেলগুলি শুরু হওয়ার একটু আগে থেকেই দুই -একটা ছেলে , রডোডেনড্রন এর লাল ফুলের গোছা হাতে নিয়ে গাড়ীর পাশে পাশে ছুটতে থাকে। পরে দেখলাম, এই ফুলের নির্যাস বোতলে ভরে বিক্রিও হচ্ছে। একটি দোকানে ঐ লাল সিরাপ দিয়ে শরবত করে খাইয়ে দেখাল। আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার রাস্তায় যেতে যেতেই জানাল, আমরা ওর গাড়ীতে ধনোউল্টির কয়েকটি জায়গা দেখে পরদিন দেরাদুন ফিরতে পারি। আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি, ওকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা না দিয়ে, অন্য গাড়ী নিয়ে ফিরল চার হাজার টাকা লাগত।

রডোডেন্ড্রন

হোটেলে খাওয়ার পর আমরা ধনোউল্টি দেখতে বেরোলাম। আমাদের হোটেল থেকে পাঁচশ মিটার মত এগিয়ে বাজার মত এলাকা। এটা ছাড়িয়ে আরও পাঁচশ মিটার এগিয়ে, ডান দিকে, পাহাড়ের ঢালে ইকো পার্ক। পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। ফুলের বাগান নেই। ধাপে ধাপে কিছু পাইন গাছ উঠে গেছে। নিচের দিকে একটা মাঠ মত জায়গায়, দুই দিকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠে, দড়ির মই এর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মত কিছু এডভেঞ্চার স্পোর্টস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা সব মিলে জন দশেক যাত্রী ছিলাম। ধাপে ধাপে একেবারে মাথায় উঠে গিয়ে উল্টো দিকের পাহাড় দেখে এলাম। বিকেলে হোটেলে ফিরে আর কিছু করার ছিল না। এখানে সারাদিন খুব বাতাস বইছে। সন্ধ্যার পর থেকে পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা।

ইকো পার্ক

একুশ তারিখ সকাল নটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে বাজার ছাড়িয়ে দশ কিমি দূরের সুরকান্দা দেবী মন্দিরে চললাম। বাজারের পর পাঁচশ মিটার পর্যন্ত কিছু হোটেল আছে। তারপর ফাঁকা পাহাড়ী পথে এগিয়ে গেলাম। মন্দির একটি পাহাড়ের চূড়ায়। নিচে রাস্তার দুই পাশে গোটা কুড়ি ডালা বিক্রীর দোকান। একটি দোকান থেকে ডালা কিনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম। একশ মত সিঁড়ি ওঠার পর কেবল কার। পাশের বাঁধানো রাস্তা ধরে কেউ কেউ হেঁটে উঠছে। রোপওয়েতে আড়াই তিনশ সিঁড়ি কমিয়ে দেয়। উপরে মন্দির চত্বরে ঐ সকালেই একশ মত যাত্রী পৌঁছে গেছে। বেশ ছড়ানো চত্বর। মন্দির প্যাগোডার মত, সুন্দর। দেবী মূর্তি বেশ ছোট; ভালো করে বোঝা যায় না। আমরা মিনিট কুড়ি উপরে থেকে নেমে এলাম।

এবার আমরা সোজা দেরাদুন ফিরব। আমাদের ফেরার ট্রেন রাত পৌনে দশটায়। মাঝে দুই একটা জায়গা দেখে যাব। ফেরার সময় মসুরি শহরকে পাশে রেখে বড় রাস্তা ধরে নেমে চললাম। মসুরি থেকে কিছুটা নিচে মসুরি লেক। রাস্তা থেকে দেড়শ মত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। একটা ঝর্নার জলকে আটকে একটা গোল সুইমিং পুলের মত করা হয়েছে। ওখানে বোটিং এর ব্যবস্থাও আছে। আর আছে বাঁধানো চত্বরের পাশে পাশে কিছু দোকানপাট। আমাদের মত বয়স্ক মানুষের কাছে অকারণে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা। এখানে একটা কথা বলি। যাওয়ার আগে আমার একটু হাঁটু ব্যথা ছিল। কেম্পটী ফলস এ তিনশ সিঁড়ি ওঠা নামা করার সময় কোন ব্যথাই ছিল না।

এরপর মিনিট পনের পর, ট্যাক্সি রাস্তা থেকে ডান দিকে সরু রাস্তা ধরে নিচে নেমে চলল। বেশ অনেকটা পথ নেমে আমরা ট্যাক্সি থেকে নামলাম। এই রাস্তাটা নামার জন্যও কেবলকার আছে। আমরা একটু পাথুরে রাস্তা ধরে নেমে গেলাম। এখানেও জলপ্রপাতের রাস্তার পাশে পাশে দোকানপাট। দোকানের ছাতার আড়ালে পড়ে আছে ভট্টা ফলস। কুড়ি পঁচিশ ফুট উপর থেকে পড়ছে জল।

ভাট্টা ফলস

আমরা মিনিট পনের থেকে গাড়ীর কাছে ফিরে এলাম। এখানে দোকান অনেক কিন্তু ভাত খাওয়ার মত হোটেল নেই। এদিকে রাস্তার পাশে পাশে অসংখ্য ম্যাগি দোকান। মসুরি ম্যাল থেকে শুরু করে যেখানেই গেলাম সবই ম্যাগি কর্নার। আমরা প্রায় দেরাদুনে পৌঁছনোর আগে একটা বড় ধাবায় ঢুকে ভাত খেয়ে নিলাম। দেরাদুনে আমাদের দেখার বাকি ছিল শুধু দুন স্কুল। ড্রাইভার বলল, পাঁচিলের দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। প্রচুর লোক দেখতে যেতো বলে ঐ ভাবে পাচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমরা তিনটে নাগাদ দেরাদুন স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের ট্রেন প্রায় সাত ঘন্টা পর। এই জন্য আমি ফেরার দিনের জন্য রিটেয়ারিং রুম বুক করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা তিরিশ টাকা ঘন্টা হিসেবে তিন ঘন্টার জন্য প্রাইভেট ওয়েটিং রুমের সিট বুক করে নিলাম। উপাসনা এক্সপ্রেস ছটায় পৌঁছে গেলেও আমরা উঠতে পারলাম রাত নটার পর। আগের দিন একটা জিনিস দেখে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। আমরা যেদিন দেরাদুনে এলাম, সেদিন দেখেছি , লোকজন ছটা থেকে ট্রেনে উঠে বসে আছে। এসব ট্রেনের জেনারেল আর স্লিপার ক্লাশে ট্রেন এলেই সবাই উঠে যায়, কিন্তু এ সি কম্পার্টমেন্ট এর দরজা আধ ঘন্টা আগে খোলে। ট্রেন ঠিক সময়েই ছাড়ল। এই ট্রেন রাত তিনটায় হাওড়ায় পৌঁছনোর কথা। শুনেছিলাম , এই গাড়ী চার পাঁচ ঘন্টাও লেট করে। কিন্তু আমাদের একেবারে তিনটা বাজার আগেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিল। তিরিশ ঘন্টা ট্রেনে বসে থাকা বিরক্তিকর। এই ট্রেন ফেরার সময় অনেকটা পথ বিহারের উপর দিয়ে, দিনের বেলা চলে। এ সি টু টায়ার এই দু চারজন টিকিট ছাড়া লোক উঠে বসে। দিনের বেলা উত্তর প্রদেশ আর বিহারের উপর দিয়ে গোটা রাস্তা এল গমের মাঠের মধ্যে দিয়ে। গোটা রাস্তাই গম কাটা আর মেসিন

গম ঝাড়া দেখতে দেখতে এলাম। তিন চার জায়গায় কিছু হরিণ জাতীয় প্রাণীর দল দেখলাম। এই নীলগাই এর মত প্রাণীগুলির ছবি তোলা হল না। মাঠে মাঠে গরু, মহিষ, ছাগল ছাড়াও এই আর একরকম নতুন প্রাণী দেখা গেল। এই ট্রেন যাত্রার সময় একটা নতুন হিন্দি কথা শিখলাম। ষ্টেশনে প্রতিক্ষালয়, শৌচালয় লেখা আগে দেখেছি; এবার দেখলাম " মুত্রালয়!" ভোর সাড়ে তিনটায় হাওড়া থেকে ইন ড্রাইভে ট্যাক্সি বুক করে দমদমে ফিরলাম। পার্কিং এর জন্য সত্তর টাকা আমাদের দিতে হল। ভ্রমণে বের হলে এরকম কিছু টাকা আক্কেল সেলামি দিতেই হয়। কিন্তু পাহেলগামে বেড়াতে গিয়ে প্রাণ দিয়ে আসতে হবে, এমন দুঃস্বপ্ন কে আর দেখেছে! ২৪. ৪.২৫.